পিতা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর

ইমদাদুল হক মিলন

বিকেলবেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল সুমি।

এমন নি:শব্দ কান্নাও কাঁদে মানুষ ! চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে, বুকের ভেতর

চাপ ধরা কষ্ট, তবু কান্নায় কোনও শব্দ নেই। যেন সুমি কোনও রক্তমাংসের মানুষ নয়, সুমি এক কলের পুতুল। চাবি দিলে যে পুতুল কেবল কাঁদে। চোখের জল কেবলই বুক ভাসায়।

বাবার মৃত্যুর পর থেকে বিকেলের দিকটায় এভাবেই কাঁদে সুমি।

এসময়কার বিকেলের আকাশ কী রকম দুখ জাগানিয়া। ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে বুকের ভেতর উথলে ওঠে প্রিয়জন হারানো হাহাকার।

মৃত্যুর পর কোথায় চলে যায় মানুষ ! ওই আকাশে !

সুমি যখন কাঁদছে অমি তখন তাঁর রুমে। হতদরিদ্র রুমে একটাই চোখে পড়ার মতো জিনিস। কম্পিউটার। পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে অমি সেই কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। মন জুড়ে অমিরও চলছে বাবার জন্যে হাহাকার। নিজের অজান্তেই যেন কম্পিউটার স্ক্রিনে অমি এক সময় লিখল, 'বাবা, এভাবে কেন মরে গেলে !'

তারপর সেই লেখার দিকে তাকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল অমি।

যে মানুষটার জন্যে এভাবে কাঁদছে দুজন মানুষ, এ বাড়ির ড্রয়িংরুমে তাঁর একটি বাঁধানো ছবি আছে। টেন-টুয়েলভ সাইজের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছবি। ছবিটি একাত্তর সালের। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন করে ঢাকায় ফিরে লক্ষ্মীবাজারের কালাম স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলেন ছবিটা। তখনও অস্ত্র জমা দেননি মুক্তিযোদ্ধারা। কাঁধে ছিল তাঁর স্টেনগান।

বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার মাথায় তখন লম্বা চুল, মুখময় দাড়িগোঁফ গোলা বারুদের ঝাঁঝে টকটকে লাল চোখ কারও কারও, যুদ্ধের ক্লান্তি শরীরময়। তারপরও অসম্ভব উজ্জ্বল মুখ একেকজনের। এই ঔজ্জ্বল্য যুদ্ধজয়ের। স্বাধীনতার।

মাসুদ সাহেবের মুখেও আছে সেই প্রখর ঔজ্জ্বল্য। স্বাধীনতার পর ঊনত্রিশ বছর কেটে

গেছে, সেই ঔজ্জ্বল্য একটুও ম্লান হয়নি। ছবির দিকে তাকালে এখনও সেদিনকার মানুষটিকে পরিস্কার দেখা যায়। ছবিতে আছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি আর কোথাও নেই।

আজ বিকেলে স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই মনে হলো পারুর। ছবিতেই আছেন মাসুদ সাহেব, স্মৃতিতে আছেন, বাস্তবে কোথাও নেই।

একথা ভেবে ছেলে এবং মেয়ের মতো পারুও কেঁদে ফেললেন। অদূরের ভাঙা সোফায় যে সেলিম বসে আছে সে কথা মনেই হলো না তাঁর।

কিন্তু পারুকে চোখ মুছতে দেখে উঠে দাঁড়াল সেলিম। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

সেলিমের স্বভাব হচ্ছে কথা শুরুর আগে মৃদু একটা গলা খাঁকারি দেওয়া। এখনও দিল। দিয়ে বলল, আপনিও যদি এভাবে কান্নাকাটি করেন তাহলে সুমি অমিকে সামলাবে কে ? এভাবে ভেঙে পড়া ঠিক হচ্ছে না !

সেলিমের কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না পারু। তবে পাশে সেলিমকে দেখে আঁচলে চোখ মুছলেন। ধরা গলায় বললেন, এই ছবিটা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ছবিটার দিকে কখনও কখনও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন, আমার জীবনের সবচে' বড় অহংকার, আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি।

সেলিম বিনীত গলায় বলল, এসব কথা এখন থাক।

এবারও তার কথা শুনতে পেলেন না পারু। আগের মতো করেই বললেন, সারাটা জীবন তাঁকে যুদ্ধ করেই যেতে হলো। আজকালকার দিনে এত সৎমানুষ হয় না। স্বাধীনতার পর ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারতেন। লাইসেন্স পারমিট, পাকিস্তানিদের বাড়ি দখল, দোকান, জমিদখল, লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবার সুযোগ সে সময় পেয়েছেন, কোনও সুযোগ কখনও নেননি। নিলে আমাদের চেহারা আজ অন্য রকম থাকত। এত নিঃস্ব অবস্থায় আমাদেরকে ফেলে, প্রায় বিনা চিকিৎসায়...।

কথা বলতে বলতে শেষদিকে গলা ভেঙে এল পারুর। শব্দ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

পারুর এই অবস্থা দেখে সেলিম দিশেহারা হলো। মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এখন এসব ভেবে আপনি যদি এমন করেন, মানে, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই, তারপরও বলি, আপনি শক্ত না হলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

পারু চোখ মুছতে মুছতে বললেন, শক্ত আমি কেমন করে হই বাবা। আমার অবস্থাটা তুমি একটু ভাব! অন্য সমস্যাগুলো না হয় বাদ দিলাম, তোমার সঙ্গে যে সুমির এনগেজমেন্ট হয়ে আছে, বিয়ের ডেট হয়ে আছে, এই অবস্থায় মেয়েটাকে আমি বিয়ে দেব কেমন করে!

এই চিন্তাটা আরও কয়েকদিন পরে করুন। মানে আমি বলছিলাম যে, সময় তো আছে!

কী এমন সময় আছে! দু আড়াই মাস! চোখের পলকে কেটে যাবে। সুমির বাবা বেঁচে থাকলে কোনও না কোনওভাবে, গরিবি হালে ব্যবস্থা একটা হতোই। তিনি যা পারতেন আমি তা তো পারব না! থাকার মধ্যে এইটুকু একটা বাড়ি। দুপয়সা সাহায্য করার কেউ নেই। তারপরও তুমি আমাকে বল আমি কিছু ভাবব না!

সেলিম মাথা নিচু করল। অবস্থাটা আমি বুঝি। তারপরও আপনাকে এইসব সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমারই বা কী করার আছে! পড়াশুনো শেষ করে বছর দুয়েক হলো ব্যাংকের এই চাকরিটায় ঢুকেছি। আমরাও মধ্যবিত্ত। ফ্যামিলির অবস্থা তেমন ভাল না।

সেলিমের কথায় পারু একটু লজ্জা পেলেন। না না, তোমাকে আমি কিছু করার কথা বলছি না। আমার মেয়ের সৌভাগ্য যে তোমার মতো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। আজকালকার দিনে এমন ছেলে পাওয়া যায় না। তোমার মতো শিক্ষিত, এম বি এ করা ছেলে, ব্যাংকে অত ভাল চাকরি কর, তোমার মতো ছেলেরা বিয়ে করার জন্য

বড়লোকের মেয়ে খোঁজে, বড়লোকেরাও মেয়ের জন্য তোমার মতো পাত্র খোঁজে। সেখানে তুমি আমাদের মতো একটা ফ্যামিলিতে...।

কথা শেষ করলেন না পারু।

সেলিম বলল, টাকা পয়সা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির মোহ সবার থাকে না। প্রথম কথা হলো আপনাদের সবাইকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, বিষয়টিকে আমি খুব সম্মানের মনে করছি।

এই বাড়ির কাজের বুয়ার নাম শিরিন। বহুদিন ধরে আছে। ফলে বাড়িতে কে এলে চা বিস্কুট দিতে হবে, কী করতে হবে, সব তার জানা, বলতে হয় না কিছুই। মাত্র কদিন আগে বাড়ির কর্তা মারা গেছেন। এই অবস্থায় বাড়িতে কাউকে আপ্যায়নের কোনও ব্যাপার নেই। তারপরও সেলিম এসেছে দেখে সেলিমের জন্য চা করেছে সে, যত্ন করে চা বিস্কুট এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে এসেছে ড্রয়িংরুমে। এসে দেখে সেলিম এবং পারু খুবই মন খারাপ করা ভঙ্গিতে কথা বলছে। দেখে আর দাঁড়ায়নি। ট্রেটা ভাঙাচোরা সেন্টার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেছে। দুজন মানুষের কেউ শিরিনকে দেখতে পায়নি।

এই রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শিরিন ভেবেছে কাজটা সে ঠিকই করেছে। দুদিন পর বাড়ির জামাই হবে যে, এনগেজমেন্ট হয়েছে, অর্ধেক জামাই সে হয়েই আছে, বাড়ির অবস্থা যাই হোক চা বিস্কুট তাকে না দিয়ে পারা যাবে না। সেই গানের মতো 'ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে'।

সেলিমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই যেন চায়ের ট্রেটা চোখে পড়ল পারুর। ব্যস্ত হলেন তিনি। চা খাও বাবা, চা খাও। আহা কোন ফাঁকে দিয়ে গেছে শিরিন, বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেছে। দাঁড়াও, শিরিনকে ডাকি। গরম করে দিতে বলি।

সেলিম অমায়িক গলায় বলল, দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না চা এখন আমি

খাব না। আমি বরং একটু দেখা করি।

হ্যাঁ, যাও বাবা, যাও। ওকে একটু সান্ত্বনা দাও। দিনরাত কান্নাকাটি করছে।

সেলিম তারপর সুমির রুমের দিকে চলে গেল।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও কাঁদছে সুমি। সেলিম এই রুমের দরজায় টুকটুক করে নক করল। চমকে দরজার দিকে তাকাল সুমি। তারপর চোখ মুছল।

সেলিম বলল, আসব ?

সুমি আবার চোখ মুছল। তারপর মাথা নাড়ল।

সেলিম ভেতেরে ঢুকল। যথারীতি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, দশ-বারো দিন পার হয়ে গেছে তারপরও চোখের পানি ফুরাচ্ছে না তোমার ?

সুমি ভেজা গলায় বলল, বাবার জন্যে চোখের পানি আমার কোনওদিনই ফুরাবে না।

কিন্তু মৃত্যু এমন এক অমোঘ নিয়তি, মানুষের সাধ্য নেই মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকা। কখনও না কখনও মৃত্যু আসবেই।

এসব বইয়ের কথা। সবাই জানে।

তারপরও এসব কথাই সারাজীবন ধরে বলতে হয়। মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার নতুন কোনও ভাষা আসলে তৈরি হয়নি। পুরোনো কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হয়। তাছাড়া মৃত্যুও তো একটা পুরোনো বিষয়। পৃথিবীর শুরু থেকে আছে, পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত থাকবে।

কিন্তু কী এমন বয়স হয়েছিল বাবার ! মানুষ তো আশি নব্বই একশো বছরও বাঁচে।

একশো তিরিশ চল্লিশ বছর বাঁচার রেকর্ডও মানুষের আছে। আবার জন্ম মুহূর্তেও মরে যায় কোনও মানুষ। মাতৃগর্ভে মরে যায়।

একটু থামল সেলিম। সুমি, তোমার মনে হতে পারে তর্ক বিতর্ক করার জন্য কথাগুলো আমি বলছি। আসলে তা নয়। আসলে অনেক কথা বলে তোমার মন আমি অন্যদিকে ঘুরাতে চাচ্ছি। তোমরা সবাই মিলে যে রকম কান্নাকাটি করছ, এভাবে চললে তোমরা সবাই অসুস্থ হয়ে যাবে। অসুস্থ হলে বিপদ আরও বাড়বে। মন শক্ত কর, শক্ত হয়ে দাঁড়াও।

সুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি চাই, সত্যি আমি চাই মন শক্ত করতে, শক্ত হয়ে দাঁড়াতে। পারি না। আমার শুধু কান্না পায়। বলে আবার একটু কাঁদল সুমি। ওড়নায় চোখ মুছল।

সুমির দিকে তাকিয়ে সেলিম বলল, কিন্তু তুমি বড়। তোমার দায়িত্ব অনেক। মায়ের কথা না হয় ভাবলে না, একমাত্র ভাইটির কথা তো ভাববে ! তোমরা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করলে ওইটুকু ছেলের মনের অবস্থাটা কী হয় ভাব তো ! তাছাড়া চারমাস পর ছেলেটির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা !

ডান হাতখানা মায়াবি ভঙ্গিতে সুমির কাঁধে রাখল সেলিম। শান্ত হও, শান্ত হও।

এই হাতের স্পর্শে সুমির কান্না আরও গভীর হলো।